শচীন দাশের গল্প

সুমিতা চক্রবর্তী

স্বাধীনতা - উত্তর পর্বে বাংলা ছোটোগল্পের ধারাবাহিকতায় পালাবদল ঘটেছে বেশ কয়েক বার। এই পালাবদলের ব্যাপারটা প্রত্যেকটি স্তরেই দেশের সমাজ - পরিস্থিতির সঙ্গে বেশ নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু; ঈষৎ সময়ান্তরে রমাপদ চৌধুরী এবং কিছুটা আলাদা দাঁড়িয়ে আশাপূর্ণা দেবী অজস্র গল্প লিখেছেন। সে-সব গল্পে সদ্যোস্বাধীন দেশে বাংলার ব্যবচ্ছেদ - লাঞ্ছিত, বিপন্ন সামাজিক পরিবেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ অবয়বটিকে চিরে চিরে দেখা হয়েছে। দেখানো হয়েছে তার ভাঙন এবং নতুন করে গড়ে ওঠার ধাপগুলি।

আবার যখন ষাটের দশকের মাঝ - বরাবর দেখা দিল শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন তখন এই অনতিস্ফীত, একটু চমক - দেওয়া গল্পধারাকে হজুগে বলে অনেকে তুচ্ছ করলেও এর মধ্যে শিক্ষিত বাঙালি তণ সম্প্রদায়ের মনের ভিতরের চেহারাটা ফুটে উঠেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এক দিকে হতাশা, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করবার বাসনা, অন্তর্মুখীনতা এবং গল্পের বিবৃতির শৈলীতে অভিনবত্ব নিয়ে আসা -- এ সবের মূলেই সমাজ - পটভূমির সুনির্দিষ্ট আবহ - চাপ ছিল।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে শু করে ষাটের দশক জুড়ে গল্প লিখে চলেছিলেন দেবেশ রায়, কমলকুমার মজুমদার,কার্তিক লাহিড়ী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, অমিয়ভুষণ মজুমদার। তাঁদের লেখায় যেমন মধ্যবিত্ত সমাজের সংকটের ছবি ছিল, তেমনই ছিল দরিদ্র - বর্গের, ভিন্নতর শ্রেণির জনসমাজের পরিচয় -- মধ্যবিত্ত সমাজ যাদের ভালো চেনে না, কিন্তু স্বাধীনতার পরে দেখা দিয়েছিল কিছুটা চেনবার চেষ্টা।

এই সময়টিতে -- অর্থাৎ ১৯৪৫-৪৬ থেকে শু করে ১৯৭০-৭২ পর্যন্ত পর্বে বাংলা ছোটোগল্পে কত না বৈচিত্র্য! সব লেখককে সব সময় একটা ধারায় ফেলাও যায় না। সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু বা পরশুরাম--- এঁরা সকলেই এক - এক জন নক্ষত্র। সবজড়িয়ে বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের এই পর্বটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্রময়।

সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে সমাজমুখীন অন্তরোপলব্ধির যে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটল তা- ও পশ্চিমবাংলার সমাজের সত্যকেই তুলে ধরে। নতুন কালের দৃষ্টিতে এই সমাজের অপূর্ণতার দিকগুলিকে দেখেছিলেন নতুন যুগের লেখকেরা। সেখান থেকেই সত্তরের দশকের নতুন ধারার বাংলা ছোটোগল্পের উৎসারণ ঘটল। আজকের বাঙালি পাঠক এই পর্বের গল্পের সঙ্গে যথেষ্টই পরিচিত এই ধারার গল্প নিয়ে আলোচনাও হয়েছে প্রচুর।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাংলা ছোটোগল্পের একটি ধারা কিন্তু কিছু অন্যরকম। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, একটি ধারা এসে পূর্ববর্তী ধারাগুলিকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিচ্ছে না। নতুন একটি স্রোতের সংযোজন ঘটছে সেখানে। তবে নতুন ধারাটির গুত্ব এখানে --- তণতর গদ্যশিল্পীরা অর্থাৎ সমকালীন প্রজন্ম কীভাবে পারিপার্শ্বিক সমাজকে এবং জীবনকে দেখছেন -- তার একটাপ্রতিচ্ছায়া এই সব গল্পে ফুটে ওঠে।

সময়ের ধারাবাহিকতা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে এই বিন্যাসের ছকটি মনের মধ্যে ধরে রাখলেও কিন্তু সর্বদাই বিশেষ একটি অথবা অপর একটি ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাবে না। কোনো শিল্পীকেই ছকে বাঁধা যায় না এবং যে - রূপবন্ধটিকে তিনি

গড়ে তুলতেচাইছেন সেটিও প্রায়শই শিল্পীর বশ্যতা না মেনে নিজস্ব স্বরূপ সন্ধান করে। অর্থাৎ গল্পটি নিজেই নির্মিত হয়, লেখককে দিয়ে কেবল লিখিয়ে নেয় তার লিপিবদ্ধ সংস্করণ। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু কখনো কখনো লেখক একটা সমস্যা অনুভব করতে পারেন। তাঁর সচেতন সামাজিক মনের অভিপ্রায় আর তাঁর শিল্পীমনের অন্তঃপ্রেরণা অনেক সময়ই এক আধারে স ার্থকভাবে সংশ্লেষিত হতে পারে না। সেক্ষেত্রে লেখকের নিজস্বতাকে তাঁর সঞ্চরণের বিশিষ্ট ভূমিতেই সন্ধান করতে হবে। তঁ াকে একটি ধারার ঝাঁকে মেলাতে গেলে চলবে না।

গল্পলেখক শচীন দাশ -- এই নামটির সঙ্গে অনেক সুন্দরবন অঞ্চলের বাস্তবতাকে মিলিয়ে নেন। এই মিলিয়ে নেওয়া ভুল নয়। যথেষ্টই সত্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ভিন্নতর ভূমির উদ্ভাসন নেই তাঁর রচনাকর্মে। সুন্দরবনকে সত্য করে তোলা সত্ত্বেও হয়তো তাঁর লেখার পৃথিবীর কেন্দ্র - স্থলে আমরা সেই আজকের সমাজ আর বিপন্ন মধ্যবিত্তকেই বেশি করে প াব। আবার সেই মধ্যবিত্ততা কিন্তু একান্ত নাগরিক বা মফস্‌সল শহরে সীমাবদ্ধ নয়। সত্যিই তা বার বার উপনীত হয় সুন্দরবনের তটভূমিতে ; শচীন দাশের গল্পে সংযোজিত করে নতুন এক দিগন্ত।

শচীন দাশের জীবনের গল্পটাও পুরোপুরি সত্তর দশকের রাজনীতিমনস্ক অন্য লেখকদের মতো নয়। শৈশবে, বাল্যে, কৈশে ারে। তাঁর পরিভ্রমণ ছিল কলকাতা শহরের বাইরে। পিতার কর্মসূত্রে ঘুরে ঘুরে কেটেছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা - শহরে। তার আগে অসমের ডিব্রুগড়ে। ইটে গাঁথা শহরের সমান্তরালে নিসর্গের টান তখন থেকেই অযাচিত স্বাভাবিকত ায় গড়ে উঠেছিল মনের মধ্যে। তারপর কলকাতায় এসে যখন বসবাস করেছেন তখন কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তরউপাধি। কাজেই কলকাতা শহরের সেই সময়ের ছাত্রগোষ্ঠী এবং র াজনৈতিক বাতাবরণ -- এসবের সঙ্গেও স্থাপিত হয়েছিল তাঁর স্বাভাবিক সংযোগ।

গতানুগতির লেখাপড়া আর অধিকাংশ বাঙালি যুবকের অভ্যস্ত রাস্তায় চাকরির সন্ধান দিয়ে শু হয়নি তাঁর কর্মজীবন। অল্প বয়সেই, বাড়িতে প্রায় কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন জাহাজ - কর্মীর তথা নাবিকের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য। কিন্তু কিছুকাল পরে ভালো লাগল না সেই কাজ। তারপর আকস্মিক যোগাযোগে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলায় এক সিমেন্ট ক ারখানায় ঢুকে পড়লেন কর্মী হিসেবে। এ - সবের মূলে আর্থিক অনটনের চাপ ততটা ছিল না, যতটা ছিল কিশোর ও তণ মনের অ্যাডভেঞ্চার প্রবণতা; বাঁধাধরা পথছেড়ে এমন কোনো জীবিকায় ঢুকে পড়া -- যেখানে একই সঙ্গে বিচিত্র প্রকৃতি অ ার বিচিত্র মানুষের কাছাকাছি থাকা যাবে। কিন্তু সে - কাজ ও ভালো লাগে না তাঁর। কারণ, কাজের প্রকৃতিটা ছিল খুবই যান্ত্রিক; মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক সন্ধানের পরিসর ছিল কম। অবশ্য পরিসর কম ছিল বলা বোধ হয় ঠিক হল না না। যন্ত্র - নির্ভর পুঁজিবাদের যুগে কোথায় মানুষ শ্বাসদ্ধ হয়ে আছে এবং পিষ্ট হয়ে চলেছে তা সেই যান্ত্রিকতার মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে শিল্পীকে। আসলে তাঁর বয়স তখনও এতটা অনুধাবনের পক্ষে পরিণত হয়ে ওঠেন।

শচীন দাশের মনের মধ্যে সাহিত্য - সৃষ্টি - কর্মের আকাঙ্ক্ষাও ছিল আকৈশোর বলবৎ। কলকাতায় ফিরে এসে সে সুযে াগটাতিনি পেলেন যেখানে কর্মসূত্রে সমাজের অবতলবাসী এবং অভাব - পীড়িত মানুষের অস্তিত্বকে অনুভব করতে প ারবেন। এবং সেই সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন সাহিত্য - মঞ্চের সঙ্গেও। তিনি বিভিন্ন রকমের কাজ করছেন -- জনগণনা থেকে ভিখিরি - গণনা পর্যন্ত। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন কিছু দিন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী কর্মজীবনের সূত্রপাত পশ্চি মবঙ্গ সরকারের এমন একটি বিভাগে যেখানে সীমান্তের গ্রাম ও জল - জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তাঁর নিত্য পরিক্রমা। এই সূত্রেই দক্ষিণ চবিবশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামগুলি, সুন্দরবন, বাদা আর নদী -নালা হয়ে যায় তাঁর এত চেনা। এই কাজের মধ্যে থেকে অঞ্চলের মানুষগুলিকে অনুভব করেন আরও কাছে থেকে। তাদের জীবিকা, সংকট, সংগ্রাম আর পরিণতির স্তরগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সামনে। কারণ তাঁর কাজটাই এমন যে, মানুষকে উৎপাদনের যনত্রহিসেবে নয়, দেখতে হবে মানুষ বলেই।

সম্পূর্নভাবে এই চাকরি - সূত্রে জড়িয়ে যাবার আগে শচীন দাশ অগ্রজ সাহিত্যিক বিমল করের সঙ্গে থেকে ছোটোগল্পের পত্রিকা গল্পপত্র সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন। ছোটোদের পত্রিকা শুকতারা -র সহ -সম্পাদকও ছিলেন।

নিয়ে কিছু বলার সুত্রপাতেই তাঁর জীবনের এই বৃত্তটি আমাদের মনে রাখতে হবে যেখানে বিশ শতকের শেষ চার দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপন এবং জীবনাদর্শ গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে। সেই সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতায় পাওয়া প্রান্তীয় বর্গের কায়িক শ্রমিক মানুষেরাও নিত্য আনাগোনা করে তাঁর শিল্প - ভু বনে। কলকাতা শহর আর জল-জঙ্গলের দেশ --

দুই-ই তাঁর সৃষ্টি - লোকে সমান গুত্ব নিয়ে উপস্থিত।
শচীন দাশের কয়েকটি গল্প সহযোগে আমরা তাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করতে পারি।
বোবা যুদ্ধ গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের আখ্যান। নতুন একটি অঞ্চলের নিজস্ব একটি বাড়িতে উঠে এসেছেন গল্পের গৃহস্বামী। স্ত্রী এবং দুই কন্যা নিয়ে শান্তির সংসার। মধ্যবিত্ত পরিবারে যেমন হয়, বাড়িটি কিনতে সর্বস্বান্তনা হলেও যথেষ্টই অর্থনৈতিক টানাটানিতে থাকেন তাঁরা। নতুন জায়গায় এসেই প্রথম আবিষ্কার নিকটবর্তী ভাগাড় এবং শুঁড়িখানা। কিন্তু নগরের সম্প্রসারণ অপ্রতিরোধ্য --- 'এর ভেতরে এদিকেও বাড়ি উঠছে হু হু করে। লোক জমি কিনছে হুটহাট; বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিনি - ম্যাক্সি - মিডি আর জিন্সের আলোয় ঝকঝকে সব নতুন মুখ।' বসবাসে শু করবার অল্প কয়েক দিন পরেই শীতলা পুজোর চাঁদা নিতে আসে মস্তানের দল। চল্লিশ টাকার জায়গায় দশটাকার প্রস্তাব শুনে তারা বিরত্ত হয় এবং পরে তণী দুই কন্যাকে পথে - ঘাটে উত্যত্ত করতে থাকে। থানায় খবর দিলেন গৃহকর্তা। ফল হল এই, ছোটো মেয়ে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মিতু একদিন হারিয়ে গেল। পাওয়াও গেল তাকে -- রত্তাত্ত, ধর্ষিত কিন্তু জীবিত। অবশেষে শরীরে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল সে; কিন্তু মনে মনে সে হয়ে গেছে অস্বাভাবিক। মানসিক চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাচ্ছে না। তারই মধ্যে একদিন তার বাবা তাকে কাছে পেলেন। আর শিশু বয়সে যেমন তাকে গল্প শোনাতেন তেমন করেই শু করলেন এক গল্প। মানুষের লড়াইয়ের গল্প। অনেক দিন পরে মেয়েটি শান্ত হয়ে বসল, শুনতে লাগল মন দিয়ে। গল্প শেষ হয়েছে --- 'এখন আটটা। শীতের কুয়াশা ভেদ করে এখন আমাদের রাণীরপুরে রোদ ফুটছে। চারপাশে ব্যস্ততা। বাজারহাট। অফিস - কাছারি। ভাগাড়ে শকুন। শুধু তারই ভেতরে এ ঘরে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে। মানুষের লড়াইয়ের গল্পবলছি।
... আমি নিশ্চিন্ত, গল্পটা শুনলে মিতুর পরিবর্তন হবে ... আমাদের মিতুর মুখে হাসি ফুটবে।'
এ গল্পকে কোনো অঞ্চলের গল্প বলব না। যদিও ভারতের এক একটি শহরের সামঞ্জস্যহীনভাবে বর্ধিত হওয়ার সমস্যাটি এখানে প্রেক্ষাপট। ভারতের মতো দেশগুলির জনবিন্যাসে শিক্ষা এবং অর্থনীতির কটিত অসাম্যও এই গল্পের প্রধান একটি মাতা। সব কিছু ছাড়িয়ে গল্পটি মানব - সম্পর্কের নিবিড় বন্ধনের উদাহরণ। অপত্য - স্নেহ এ গল্পে কেন্দ্রীয় অনুভব। কিন্তু আবেগের অতিরেক নয়; গভীর দায়িত্ববোধ - সমৃদ্ধ পিতৃস্নেহ এই গল্পের প্রধান উপলব্ধি।
উল্লেখ করা যায় -- পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী - স্ত্রী, বাবা, মা এবং সন্তান -- মানুষের সমাজ - জীবনের এই আদি প্যাটার্নটির চিত্রায়ন তাঁর গল্পে খুব বেশিই দেখা যায়। একাধিক গল্পে আছে স্বামীর মানসিক অস্বাভাবিকতার সূত্রপাতের এবং দুরারোগ্য কোনো রোগের আত্রমণ - সম্ভাবনায় স্ত্রীর মনের মর্মান্তিক শঙ্কাকে তুলে ধরবার প্রয়াস।
বস্তুত মনস্তত্ত্বমূলক সূক্ষ্ম সমস্যার গল্পের দিকে বেশ আকর্ষণ আছে শচীন দাশের। মানুষ স্বভাব - জটিল প্রাণী। মনের নানা বিধ গ্রন্থিগুলিকে এবং অনতিস্পষ্ট রন্ধ্রগুলিকে অনেকেই স্বাভাবিক জিয়ন শত্তিতে চাপা দিয়ে রেখে সুখী ও নিশ্চিন্ত প্রচ্ছদে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যাদের মনের জোর কিছুটা কম, আত্মনিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে দুর্বল -- তারা নিজেদের সেই ফাঁকগুলিকে আড়াল করতে পারে না। তার ফলে তাদের অস্বাভাবিক মনে করে চারপাশের মানুষ। কিন্তু এক দিক থেকে দেখতে গেলে তারাই স্বাভাবিক, কারণ নিজেদের সেই অন্ধ বিন্দুগুলিকে তারা কৃত্রিম আলোকিত আড়াল দিয়ে রাখতে শেখেনি। এ ধরনের গল্পকে পরিস্ফুট করে তোলাদুরূহ। কারণ আখ্যান সেখানে জায়গা নেই না কোনো দিক থেকেই। সেখানে গল্পটি দাঁড়ায় কেবল সম্পর্ক - মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম টানের উপর।
জীবনে প্রবেশ (১৯৯২) গল্পটিকে নেওয়া যেতে পারে উদাহরণ হিসেবে। শশাঙ্ক নীরব স্বাভাবের মানুষ আর পাঁচ জন স্বাভাবিক মানুষের মতো সে সাধারণ কথাবার্তাও বলতে অপারগ। সেজন্য রমলার বিবাহিত জীবন কিছুটা অতৃপ্তিতেই কেটেছে। তারই মধ্যেএসেছে দুই সন্তান। তারপর একদিন অ্যাকসিডেন্ট -এ একটি পা কাটা গেল শশাঙ্কর। কাঠে পা এবং ত্রাচ নিয়ে চলতে থাকে জীবন। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে শহরতলি থেকে কলকাতায় যাবে বলে জেদ ধরে শশাঙ্ক। তবে এই আগ্রহে স্ত্রী ও কন্যা প্রাথমিক বাধা দিলেও মেনে নেয়। কিন্তু অত্যন্ত বিরত্ত হয়ে থাকে পুত্র রাজু। কাঠের পা নিয়েই যথেষ্ট স্বচ্ছন্দভাবে লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ে এবং কলকাতায় এসে ঘুরে ঘুরে বাজার করে শশাঙ্ক। অনেক দিন পরে সফলভাবে একটি কর্তব্য সমাধা করতে পেরে শশাঙ্ক যেন একটু একটু করেহয়ে ওঠে অন্য মানুষ। চলতে চলতে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। রমলা কাছে এলে সে হঠাৎ বলে ওঠে আপাতভাবে অপ্রাসঙ্গিক একটি কতা---'রমলা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

তাকালে শশাঙ্কই আবার বলে ওঠে, কি কথা জানো! ভাবছিলাম, এতদিন আমি কোথায় ছিলাম! তোমার মধ্যে, রাজু অ ার মলির ভেতরে নিজেকে কেন আবিষ্কার করিনি। এতদিন তবে কি করেছি। কেন রমলা, কেন পারিনি? আর তুমিই বা কেন বলোনি আমাকে।' ---অল্প শক্তিসম্পন্ন কোনো লেখকের পক্ষে এই গল্পটিকে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। দীর্ঘকালীন এক সম্পর্ক - রহস্যের গল্প। কম কথার একজন মানুষ। নিজের সঙ্গে কোনো সহজ সেতু সে গড়ে নিতে পারে না কাছের ম ানুষদের নিয়েও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সত্যি সত্যিই সে দূরে রেখেছে নিজেকে। তার স্ত্রী - পুত্র - কন্যা তার ক াছেরই মানুষ, কেবল সংযোগের সেই সেতুটি দৃষ্টিগোচর নয়। শশাঙ্কর মনের দেওয়ালে প্রথম ফাটল দেখা দিল দুর্ঘটনায় একটি পা হারিয়েও যখন সে কাঠের পা নিয়েই মোটামুটি সচল হয়ে উঠল। সেই বুঝি প্রথম মনের দেওয়ালের ফাটল দিয়ে ঢুকল প্রথম আলোর রেখা। মেয়ের বিয়ের বাজার করতে যাওয়ার ইচ্ছেটা সেই আলোরই উদ্ভাস। হয়তো তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মনে জমা হয়ে ছিল অভিমান ও অস্বস্তি। তবু তা যে প্রকৃতদূরত্বছিল না তা অনুভব করা যায় তাদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু সহমর্মী সংলাপে। বাবাকে সঙ্গে নিতে ছেলে রাজুর আপত্তি যত ঢ় ভাষাতেই প্রকাশিত হোক না কেন, আসল কারণট া বাবার অসুবিধে সম্পর্কে চিন্তা। নিজে থেকে শশাঙ্ক সঙ্গে যেতে চেয়েছে বলে অবাক হলেওভিতরে ভিতরে দ্রব হয়ে ওঠে শশাঙ্কর স্ত্রী এবং মেয়ে। এইভাবে শচীন দাশ প্রাত্যহিকের অতি স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে দিয়েই শশাঙ্কর আত্মানুসন্ধানের এবং আত্মদর্শনের উপলব্ধিতে পৌঁছোবার আবহমণ্ডল গড়ে তোলেন। তারপর যখন শেয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রিট যাবার পথেহাঁটতে হাঁটতে অতি ব্যস্ত রাস্তায় সহসা শশাঙ্ক সেই মনের সেতুটি গেঁথে তুলতে চায় তখন ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ল াগে না একবারও।

জীবনে প্রবেশ গল্পটিকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি এজন্যই -- এই গল্পের ভিতর মনের স্তর - পরম্পরার উন্মোচন ছাড়া আর কোনো বক্তব্যই নেই। অনেক গল্পেই শচীন দাশ এই দেশের অদ্ভুত দারিদ্র্য এবং সেই দারিদ্র্যের মোকাবিলায় সর্ব - রিক্ত মানুষগুলির নিজস্ব প্রতিরোধ - প্রয়াসের কথা বলেন। সব সময়ই প্রয়াস সফল হয় না। কখনো মানুষগুলি কুৎসিত এবং আত্মক্ষয়ী অন্তর্ঘাতে জড়িয়ে পড়ে; হিংস্র জান্তবতায় ছিনিয়ে নিতে চায় নিজেরই সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীর লুকিয়ে রাখা খাবার। কখনো সেই প্রতিরোধ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেখানে লেখকের বক্তব্যের সন্ধান পেতে আম াদের কোনো বাধা ঘটে না। ভারতীয় সমাজের কুৎসিত দারিদ্র্যতাঁর মনকে বিচলিত করে বলেই তিনিও পাঠকের মনের মধ্যে সেই আঘাতের ক্ষতচিহ্ দাগিয়ে দিতে চান। এই গল্পগুলিকে আমরা খুবসহজেই 'সমাজমনস্ক' আখ্যা দিতে পারি।

নিবন্ধের শুতে যে - গল্পের উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেও আছে ভারতের মতো বিক্ষিপ্ত ভাবে উন্নয়নশীল দেশে তথ াকথিতএবং উপরিতল - সর্বস্ব নগরোন্নয়ন এবং সেই আপাত উন্নয়নের ফাঁসের মধ্যে আটকে পড়া মধ্যবিত্তের কাহিনি। এই গল্পগুলিও স্পষ্টতই সমাজ-মনস্ক। এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে আর্থ - সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমি তথা এই চালক - শক্তিগুলি ব্যাখ্যা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু জীবনে প্রবেশ গল্পটিকে সেভাবে ব্যখ্যা স্বাতন্ত্র্যে প্রাণী - জগৎ থেকে আলাদা এবং সহধর্মী অন্য মানুষদের থেকেও পৃথক। যেখানে সে অনেকের একজন নয়, গোষ্ঠীর সদস্য নয়, সেখানে সে একক, স্বতন্ত্র - অস্তিত্ব। শচীন দাশের অধিকাংশ গল্পের মূল শক্তিটা কিন্তু এখানেই। তিনি শহরতলির গল্প লেখেন -- যে সব শহরতলির সঙ্গে বাস এবং লোকাল ট্রেনের চলন্ত পথে শহরের সংযোগ। তিনি মধ্যবিত্তের ফ্ল্যাট, শহরতলির মাথা গে াঁজবার জায়গা, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, বস্তির চত্বর আর শহরের ফুটপাত এবং এইসব জায়গার বাসিন্দাদের নিয়ে গল্প লেখেন। কিন্তু প্রায় সব গল্পের অভ্যন্তর থেকে উঠে আসে মানুষের মনের হাজার গ্রন্থি, শতেক ভাঁজ। সেখান থেকেই গল্পটি নিজস্ব সত্তা অর্জন করে।

সত্তরের লেখকদের অন্যতম শক্তিশালী এক বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক মানুষকে প্রাণবন্ত করে সাহিত্যে স্থান দেবার সাগ্রহ অভিপ্র ায়। সত্তর দশকের প্রারম্ভ-লগ্ন থেকেই বাংলার ছাত্র ও যুবকেরা নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্তাপ জেনেছিলেন। এই অ ান্দোলনের অন্যতম অভিমুখীনতা ছিল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের পরিসীমা ছাড়িয়ে; নগরের বিদ্যুৎ - আলোকিত দপ্তর, ব াজার ও প্রমোদভবনগুলি ছাড়িয়ে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের সমাজ ও জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা। এই শিল্পদৃষ্টি সূত্রপ াত ঘটেছিল তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। যদিও সেই ধরনটা ছিল আলাদা। সেখানে বাস্তবের ছবি ছিল কিন্তু বাস্তবের সেই বিবরণকে অভিযোগের স্বরে পরিণত করা হয়নি ততটা। সত্তর - পরবর্তী গল্পকারেরা তাঁদের বিবরণের মধ্যেই তুলে ধরলেন অভিযোগের আঙুল। উচচতর সমাজ, খেতে পাওয়া সমাজের কাছেই সেই অভিযোগ --- বংশ

ানুক্রমিকভাবে বঞ্চিত অঞ্চল এবং জনজাতি - গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত সেই অভিযোগ।
তাই আঞ্চলিক সাহিত্যের নতুন দিগন্তের বিস্তার ঘটেছে সত্তর - পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের কলমে। কল্পনায় দেখা এবং উপভোগ করা নদী - পাহাড় - অরণ্যের এবং তথাকথিত সরল গ্রামবাসীদের নিয়ে স্বপ্নচারী লেখা নয়। প্রকৃত বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো একটি অঞ্চলের সমগ্র সত্যকে নিখুঁতভাবে মূর্ত করে তোলে।
শচীন দাশ প্রধানত বেছে নিয়েছেন সুন্দরবন অঞ্চলটি। কর্মসূত্রে এই অঞ্চলের নদী আর অরণ্য, জনজীবন আর বাঁচবার সংগ্রামকে চিনেছেন গভীরভাবে। ভালোবেসেছেন এই বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদের দেশ আর অভাবতাড়িত মানুষগুলিকে। তাদের নিয়ে লিখেছেন গল্প।
অঞ্চলভিত্তিক সাহিত্য বাংলাভাষায় রচিত হয়েছে বিশের দশক থেকেই। শৈলজানন্দের কয়লাখনি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর পাড়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরভূম, সতীনাথ ভাদুড়ীর পুর্ণিয়া কাটিহার -- এই সবই আমাদের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত আছে অনেক কাল। অঞ্চলভিত্তিক সাহিত্য কোন গুণে শিল্পোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে, তার একটি শর্ত জানা আছে আমাদের সকলেরই। তা হলে অঞ্চলটিকে সত্য করে তুলতে হবে তার ভুগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিক পরিমণ্ডল আর অঞ্চলের সাহিত্যিকেরা তুলে এনেছেন তখন প্রকতপক্ষেই পুরলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, সুন্দরবন, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চল নতুন করে মূর্ত হয়েছে সাহিত্যপাঠক মধ্যবিত্ত বাঙালির সামনে।
কিন্তু আঞ্চলিক সাহিত্য কেবল অঞ্চলের প্রতিরূপ নির্মাণেই সত্য হয়ে ওঠেনি। সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। এক একটি মানুষ থাকে যারা সেই অঞ্চলিটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। বিশেষ ওই পরিমণ্ডলটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে তার আর কোনো স্বতন্ত্র চরিত্র অবশিষ্ট থাকে না। সে প্রাণী থাকে, কিন্তু মানুষ থাকে না আর। তারাই যথার্থ ভূমিপুত্র। যদি লেখক এই মানুষগুলিকে সত্য করে তুলতে নাপারেন, তা হলে তাঁর কলমে আঞ্চলিক সাহিত্য ঠিক ততটা উত্তীর্ণ হতে পারে না। সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই, তারাশঙ্কররের বনোয়ারিযতটা অঞ্চল - সম্ভব মানুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুবের যেন ঠিক ততটাই পদ্মা - পাড়ে ভূমিপুত্র হয়ে উঠতে পারেনি। তার সংকটের ধরণটি আলাদা। জেলে না হয়ে মাঝি বা কৃষক হলেও তেমন কিছু যেত - আসত না। পদ্মার জায়গায় গঙ্গা হলেও ক্ষতি ছিল না তেমন। তবে এই তিনি লেখকই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করেছেন যা আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবশ্যিক।
সত্তর - পরবর্তী লেখকেরা অনেকেই আঞ্চলিকতা প্রতিভাস নির্মাণে দক্ষতার পরিচয় দেন। ভাষার আঞ্চলিক রূপটিকেও অনেকটা তুলে ধরতে পারেন। তবে সকলেই ভাষাটিকে যথাযথভাবে অনুলিখিত করেন না সচেতনভাবেই -- নাগরিক ও শিক্ষিত বাঙালির মান্য চলিত বাংলা ভাষায় লেখা সাহিত্য পাঠের অভ্যাসের কথা মনে রেখে। সতীনাথ, তারাশঙ্কর এবং পরবর্তী কালে মহাশ্বেতা দেবী একটি শিল্পিত ভাষা - নির্মাণ - পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। কিছু শব্দ, কিছু সংলাপ, প্রবাদ - প্রবচন - বাগধারা তুলে নিয়েছেন অঞ্চলের ভাষা থেকে। কিন্তু মান্য চলিত বাংলার সঙ্গে তাকে মিশিয়েছেন এমনভাবে যে, সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার স্তর থেকে তা বিচ্যুত হয়নি। এই পদ্ধতিই কম - বেশি প্রয়োগ করেছেন সত্তর - পরবর্তী লেখকেরা এবং শচীন দাশ। অবশ্য শচীন দাশ যে - অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গল্প লেখেন তাদের ভাষা শহরের পাঠকের কাছে খুব দুর্বোধ্য নয়।
কিন্তু অনেক সময় অঞ্চল - সম্ভব চরিত্রের নির্মাণে একালের লেখকেরা সম্পূর্ণ সফল হন না। চল্লিশ - পঞ্চাশের লেখকদেরমধ্যে সতীনাথ আর তারাশঙ্কর ছাড়া কে-ই বা ততটা সফল হয়েছেন? সমরেশ বসুর গঙ্গা উপন্যাসের বিলাসকেও অবশ্য সার্থক চরিত্রায়নের কোঠায় ফেলা যায়।
শচীন দাশের কোনো কোন গল্পে আমরা কিন্তু এমন চরিত্রের সন্ধান পেয়ে যাই যারা সুন্দরবনের জলে, হাওয়ায়, নোনামাটিতে আর মাছ - কুমির - বাঘের একান্ত নৈকট্যে বেড়ে ওঠা মানুষ। তারা অবিচ্ছিন্ন তাদের অঞ্চল থেকে। তেমনই একটি গল্প ট্যাংরা (প্রকাশ ১৯৯৬)।
প্রথমেই সেই জল - মাটির পটচিত্র --- 'রাস্তা তো নয়, নদী পাড়ের বাঁধ। এপাশে বাবলা, আকাশমণি, কেটকী আর হেঁতালের ঝোপ। ওপাশে বাঁধের গায়ে ঢাল ও তারই নিচে স্রোতস্বিনী; রাস্তাও তাই বাঁধের ওপর, আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ। । বর্ষায় এই পথটাই জল পড়ে পড়ে একদম আঠার মতো চটচটে। পা রাখলেই তখন পা হড়কে যায়। দুই চরণ শূণ্যে উঠেই তখন দেহকে আশ্রয় দেয় সে চটচটে কর্দমের গভীরে। কিন্তু এ অঞ্চলের মানুষের তাতেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। আর

চলেও যে হরিণের মতো; জায়গা বুঝে বুঝে, পা ফেলে ফেলে, চোখ কান সজাগ রেখে।' ---অল্পই বর্ণনা কিন্তু বাতাবরণের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তাতেই।

খুব বড়ো গল্প নয়। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই মূল চরিত্রের দেখা মেলে। অল্প বয়সে ছেলে ভোমরা নদীতে মাছ ধরত। বেশির ভ াগই ট্যাংরা আর বাগদার চারা। বাবা মারা গেছে অল্প দিন আগে। বাড়িতে আছে মা আর ছোটো দুই ভাইবোন। ভাত জোটে দু-তিন দিনঅন্তর একদিন। ভোমরা অক্ষর চেনে, গুনতেও শিখেছে তবে হাজার পর্যন্ত হিসেবে রাখতে পারে না। শিখেছিল প্রাইমারি স্কুল, এখন সে স্কুলের নামও ভুলে গেছে।

ভোমরা চেনে জল। চেনে জলের ধারে ধারে আঁকাবাঁকা রাস্তা। চেনে ডিঙি ও খ্যাপলা জাল, মাছের চারা। তাকে চিনতেই হয়েছে গঞ্জের আড়তের পাইকারকে। সে চেনে কামট আর ঘড়িয়াল। এছাড়া তার জীবনবৃত্তে আর কোনো বিন্দু নেই। এই ভোমরাকে ঢোঁড়াই আর বনোয়ারির পাশেই রাখা যেত যদি কালের বিবর্তনে তাদের জীবন - পরিণাম যেমন দেখানো হয়েছে তেমন দেখানো যেত ভেমরার বেলাতেও। কিন্তু শচীন দাশের ছোটোগল্পটি উপন্যাস নয়। বিস্তার ও বিবর্তনের পরিবর্তে ভোমরার ছোটো জীবনটিকে একটি ছোটো গর্তে আলো ফেলার মতো করেই দেখিয়েছেন তিনি। সেদিক থেকে ভোমরা আর তার জন্মভূমি অনেক বেশি একাত্ম। সব ঢোঁড়াই 'রামায়ণজী' হয়ে উঠতে পারে না; সব বনোয়ারি নিজের জীবনের আঘাতের ব্যথার সঙ্গে হলেও শক্তিমান উত্তর - প্রজন্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অনেকেরই জীবন ভোমরার মতো। প্রস্ফুটিত হবার মুখেই যে মাটিতে জন্মেছিল, সেই মাটিতেই ঝরে যায়।

ভোমরার জীবন কী রকম দেখে নিয়েছি আমরা। এবারে তার মৃত্যু গল্পটা শোনা যাক। ভোমরা একদিন দেখল জলে ভেসে আছে এক মরা গো। ব্যাপারটা সে জানে। সুবিধে মতো মরা গো পেলে তার পেট চিরে, নাড়ি - ভুঁড়ি বার করে, পায়ে কা ঠি বেঁধে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে। নতুন খাবারের লোভে গোর পেটেরর মধ্যে ঢুকে পড়ে রাশি রাশি চারা মাছ, মূলত ট্য াংরা। গোর পেটের খোল ভরতি হয়ে গেলে অপেক্ষমান ডিঙির লোকেরা গোটাকে তুলে পেট থেকে মাছ বার করে --- একসঙ্গে অনেক। লাভ থাকে প্রচুর। এই গোটা কাদের! কোনো কারণে তারা হয়তো গোটার সঙ্গে ভাসতে পারেনি। ভে ামরা একা, তার দল নেই। একা এত বড়ো ফুলে ওঠা মরা গো কব্জা করা মুশকিল। তার উপর আছে জলের টান। ভে ামরা ভাবল -- খ্যাপলা জালটা জলের পাশে কায়দা পুঁতে রেখে জলে নেমে গোটাকে পাড়ের দিকে ঠেলে আনবে মাঝ গ াঙ থেকে। জল সে চেনে মাছের মতোই। পৌঁছে গেল গোর কাছে এবং গোর পেটের খোলের মধ্যে খানিকটা ঢুকে বুঝতে প ারল ভেতরে অজস্র মাছ। এত মাছ - জাল ফেলে মাছ - ধরা ছেলেটি কখনো একসঙ্গে দেখেনি। আড়তে গেলে অনেক পয়সা পাবে। ভোমরার মনের ভাবনাকে ভাষা দিয়েছেন লেখক---

আরিববাস, অ্যা - তো। এ যি হাজারি হাজারি, ঝাঁক বাঁধি আসিছে। দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। বেশি রোস্তাদি কোর না ... আস্তেআস্তে আগে পাড়ে টেইনে নি... তারপর মড়াটার পেট-খোল থেক্তি সব বেরিয়ে আসবে। বেরিয়েই লাফবে, নাচবে আর ছিটকে পড়বে। না না ... তুলবে না ইখন ... আগে গুনতি হোক... গুনতি করা হোক... তারপর ঝাবে সব পাখি দ াসের আড়তে। তার এবারি কিন্তুক বেশি পয়হা দিতি হবে পাখি কা ... না না না হাসি নয়... মাল বেশি পয়হাও বেশি দিতে হবে গো কাকা ... ভোমরা তাকায়। চারপাশে চোখ রাখে। কিন্তু দেখতে পায় না কিছু। চারপাশটা কেমন ধুসর এবং সেই ধূসরে হাজারে হাজারে ট্যাংরা।

ভোমরা জীবনের শেষ পর্য় ঘনিয়ে আসছে এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। গোর পেটের মধ্যে মাথাটি ঢুকে যাবার পর অন্ধকারে এবং টাটকা হাওয়ার অভাবে, পচা মাংসের গন্ধেও ঝাঁজে তার জ্ঞান লুপ্ত হয়। গোর পেটেরর মধ্যে আটকে যাওয়ায় সাঁ াতার জানার দক্ষতা কোনো কাজে আসে না। হাজার হাজার ট্যাংরা মাছ যেভাবে মরে, সেভাবেই মৃত্যু হয় ভোমরার।

যারা গো ভাসিয়েছিল তারা অপেক্ষা করছিল দূরে। কারণ তাদের ডিঙি দাঁড়ে টানা নয়; মেশিন লাগানো ভটভটি। অ াধুনিক প্রযুক্তি, কিন্তু শব্দ পেয়ে মাছ পালাবে। অনেক পরে তারা দড়ি টেনে গো পারে তুলল এবং দেখল --- 'গটার কাটা পেটের খোলের মধ্যে একটা ছেলের মাথা ঢোকানো। মরে শাদা হয়ে আছে।'

তারা দুঃখিত হয় কিন্তু জীবিকার সংগ্রাম মানবিক অবসর মুহূর্তগুলিকেও কেড়ে নিয়েছে। কাদের ছেলে তা খোঁজ করব ারও সময় নেই। সৎকারের প্রশ্নই ওঠে না। মরা মাছের মতোই তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেদের কাজে চলে যায় তারা।

ভোমরা ভেসে চলে ---'পেছনে পেছনে আবারও খুদে প্রাণীর ঝাঁক। ঝাঁক বেঁধে আবারও চলে নতুন খাবারের লোভে।'
এই গল্পের ভোমরা সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবী ছাড়া আর কোনো চেহারা নিয়েই আমাদের স্মৃতিতে কখনো জেগে উঠবে না। একটি ভোমরা অনেক ভোমরার পরিচয়বাহী প্রতীক হয়ে ওঠে। সে প্রতীক বিশেষভাবে সুন্দরবন ও সেই অঞ্চলের মানুষের চিরকালীন খাদ্য - খাদক সম্পর্কের প্রতীক। সমস্ত গল্পটির বয়নে -- সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, মৎস্যজীবিকার অ াশর্ষ সুলুক - সন্ধানে এবং ভোমরার জীবন ও মৃত্যুতে সুন্দরবনের জল - জঙ্গল স্পন্দিত হয়ে উঠেছে।
আর একটি গল্পের দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। গল্পটির নাম ঘোঘ (১৯৯৬)। কিছুটা ভিন্নতর সামাজিক শ্রেণির সদস্য মন্মথ গিরি। সে ঠিক প্রতিনিধি হিসেবে গল্পে আসেনি, এসেছে ব্যক্তি রূপে। কিন্তু সেই ব্যক্তি মন্মথ আর তার নদীর পাড়ের ব াসভূমির পরিমণ্ডল এই গল্পে অবিচ্ছিন্নভাবে দেখা দেয়। সে খুব গরিব নয়। খেতের ফলনে ভালোই চলে যায় তার। তার বসবাসের অঞ্চলটি নদীর একেবারে ধারে। নদীর উপর সেখানে দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া আছে। বাঁধের উপর রাস্তা। জল বাঁদের গায়ে ধাক্কা মারে সর্বক্ষণ। নোনা জলের ধারালো স্পর্শে চুলের মতো চিড় ধরতে থাকে বাঁধের গায়ে। ক্রমেই ফাটল ব াড়ে। বসতিতে ঢুকে পড়ে নোনা জল। সারা রাত জলের গর্জন। সব সময় বাঁধের দেখাশোনা করতে হয়। কোথায় ঘোঘ লেগেছে অর্থাৎ ধরেছে চিড়। কোথায় নতুন মাটি ফেলা দরকার, কোথায় ফাটল বাড়ছে।
মন্মথ গিরির সত্তা ওই নদীর বাঁধের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। সারা রাত জলের গর্জন। মাঝে মাঝে পাড়ের মা টির চাঙড় ভেঙে পড়ে জলে। আওয়াজে শিউরে ওঠে মন্মথ। বর্ষার অবিশ্রান্ত জলে মাটি নরম হয়ে যায়, পূর্ণিমার ভরা কে াটালে ফুলে ওঠেজল। সব দিকে নদী -- সপ্তমুখী, ঠাকুরান; টুকরো টুকরো দ্বীপ। এর মধ্যে বাস করে মন্মথ। তার ঘরবাড়ি আছে, স্ত্রী - পুত্র আছে, সংসারে অশান্তিও নেই। তবু তার মনোরাজ্যের অনেক -- অনেকখানি অংশ জুড়ে বিপুল জলরা শির পাশে দাঁড় করানো বাঁধটি আছে অনড় হয়ে। ওই বাঁধই তার অস্তিত্বের নিরাপত্তা। বাঁধই তার হৃদয়ের শান্তির চাবি। বিশেষ করে রাতে --- যখন নির্জন নিঃশব্দ হয়ে যায় সব কিছু বিদ্যুৎ - বিহীন ঘরে নটার মধ্যে খাওয়া - দাওয়া চুকিয়ে দীর্ঘ রাত্রি সামনে রেখে বিছানায় যায় মন্মথ, ছেলে প্রতীম এবং স্ত্রী সুশীলা - তখন তার সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে নেয় সেই অকূল জলের অবিরত আঘাতের শব্দ আর মানুষের হাতে গড়া বাঁধটির এককপ্রতিরোধ।
মন্মথ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। তাঁর একটি পা খোঁড়া। তাতে অবশ্য হাঁটা - চলার বাধা ঘটে না। তবে ভঙ্গিটা হয়ে যায় প্রতিবন্ধীর। তবু মনের ভিতরে প্রতিবন্ধী সে নয়। একটি লাঠি আর পাঁচ ব্যাটারির টর্চ হাতে নিয়ে সে মধ্যরাতে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে। স্ত্রী সুশীলা প্রথম প্রথম বাধা দিয়েছে -- ভয়ে এবং অভিমানে। কিন্তু মন্মথর মনকে টেনে রাখতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে সে সেই বাঁধকে বলে সতীন। মন্মথ সারা রাত ঘুরতে থাকে বাঁধের উপর। টর্চের আলো ফেলে দেখে কে াথায় লেগেছে ঘোঘ, ধরেছে চিড়, চিড়থেকে ফাটল। কোথায় মাটি আলগা, কোথায় নরম, কোথায় পাড় থেকে চাঙড় পড়ে যাচ্ছে জলে। এসব দেখাশোনার দায়িত্ব সরকারের প্রতিনিধির। মন্মথ একথা কিছু করতেও পারবে না। সে নিয়মিত খবর দেয় অঞ্চল - প্রধানকে। কিন্তু প্রতি রাতেই সেই বাঁধের উপর নিজের পদসঞ্চার না ঘটিয়ে থাকতে পারে না।
গল্পটির একটি 'গল্পাংশ' আছে। সেটি গতানুগতিক। দুর্গাপুরে চাকরি করা দূর সম্পর্কের ভাই ভুবন মাঝে মাঝে আসে ত ার বাড়িতে। খুশি হয় মন্মথ, আদর - আপ্যায়ন করে। সুশীলা এবং প্রতীমের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ভুবনের। সে স্বভাবত হীন - চরিত্র বা কামুক নয়। কিন্তু ক্রমশ সুশীলার মনের শূন্যতার পরিচয় পেয়ে এবং প্রতি রাত্রেই মন্মথর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ আসতে থাকায় প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই সুশীলা ও ভুবন ভিন্নতর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। এক রাত্রে হঠাৎই তা আ বিষ্কার করে মন্মথ। স্তব্ধ হয়ে যায়। বেরিয়েপড়ে ঘর ছেড়ে, ছুটতে শু করে বাঁধের দিকে। লেখকের কলমে উঠে এসেছে গল্পের পরিসমাপ্তির কয়েক ছত্র।
ঘোষ তো লেগেছে। কিন্তু ভেতরে ভেতের ছড়িয়ে সে যে এত দূরেও এসেছে তা কেমন করে জানবে মন্মথ।
মন্মথ ছুটল।
টর্চ না থাকুক, তবু সে যাবে। অন্ধকারেই গিয়ে দেখবে বাঁধের অবস্থা। দেখবে ঘোঘ লেগে লেগে চুলের মতো ফাটলটা কী করে এত ভেতরের ছড়িয়ে পড়ল।
অন্ধকারেই জলকাদা ভেঙে দৌড়ল মন্মথ। যেন তাড়া খাওয়া এক ক্যাঙা। তাড়া খেয়েই সে ছুটছে এবং নদীর দিকে।
গল্পটি কিন্তু সুশীলা - ভুবন - মন্মথ সম্পর্কের বিন্যাসের উপরে কোনোভাবেই দাঁড়য়নি। স্বামীর ঔদাসীন্য, এবং স্ত্রীর শূন্যত

া - বোধের স্তরপথে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ এবং গোপন প্রেমের সঞ্চারের এই থিম ছোটোগল্পে অতি পরিচিত এক ছক। গল্পটি আসলে ভর করেছে মন্মথ চরিত্রটিকে। মন্মথ আর রাতের নদী; মন্মথ আর প্রকৃতির শক্তির বিপুলতার উপলব্ধি; মানুষের প্রতিরোধের বাঁধ মন্মথর মনের আশ্রয়স্থল; বাঁধটি সুরক্ষিত থাকুক -- মন্মথর মনের এই ব্যাখ্যাতীত ব্যাকুলতা --- এখানেই গল্পটির অন্তর্গত সত্য। মন্মথ চরিত্রটির এই স্বাতন্ত্র্য লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলছেন।
গল্প - শেষে মন্মথর সংসারের নিরাপত্তা - বেষ্টনীতে ফাটল ধরবার সত্যের সঙ্গে বাঁধের গায়ে ঘোঘ লাগার উপমাটি যথাযথ মানুষের গড়ে তোলা সামাজিক ঘরের দেওয়ালও মানবপ্রকৃতির আদি টানের কাছে প্রায়ই ভেঙে পড়ে। মন্মথর বিবাহিত জীবনের সামাজিক চুক্তি আকাঙক্ষার তরঙ্গ - অভিঘাত খতে পারেনি। জল আর বাঁধের এই পারস্পরিক বিদ্ধতার সত্যটি উপলব্ধি করেছিল মন্মথ। কিন্তু ঘরের দেওয়ালকেও একই সতর্কতায় রক্ষা করা প্রয়োজন--- বলেছিল সেই সত্য। মানুষের অস্তিত্ব স্বভাবতই নিঃসঙ্গ। কোনোদিকেই তার নিরাপত্তা নিছিদ্র নয়। এই উপলব্ধিই হয়তো লেখকের অবিষ্ট। এখানেও কিন্তু গল্পটি মনস্তত্ত্বের একটি জটিল পাকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। শচীন দাশের ছোটোগল্পের অন্তঃশক্তি এই অনুভবে এবং বাইরের শক্তি দেশ - কালের পরিমণ্ডল রচনা দক্ষতায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com